ISSN 2519-6030

উত্তরা ইউনিভার্সিটি

লেখনী

ভাষা,সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল

Lekhani : A Journal of Language, Literature and Culture

প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৩
Volume 1, January 2017

Uttara University

হিমেল বরকত*

রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী' ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

সারসংক্ষেপ : *বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতা-কাহিনী' একটি শিশুতোষ রচনা। শিশুতোষ হলেও এ গল্পের ভেতর রূপকের ছদ্মবেশে ছড়িয়ে আছে তৎকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিক্ষা-কাঠামোর নানামাত্রিক ত্রুটি। এর আপাত নিরীহ ভাষ্য ছাপিয়ে উৎসারিত হয়েছে নানা কৌণিক ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ– যার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশ করেছেন বিদ্যমান শিক্ষা-ব্যবস্থার অসংখ্য সীমাবদ্ধতাকে। রূপক-প্রতীকের আড়ালে উপস্থাপিত সেসব দুর্লক্ষণ এখনো আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহাল রয়েছে, ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির পরও। ফলে, রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষা-সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা আজকের দিনে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। প্রস্তাবিত গবেষণা-প্রবন্ধটি এই উপযোগিতার আলোকে রচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চান নি। প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে ইট-পাথরের রুদ্ধ কক্ষে যে-শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ তাকে জীবনের শিক্ষা বলতে নারাজ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, স্বজন, চারপাশের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা, খাঁচাবন্দি তোতাপাখির প্রাণহীন নির্জীব শিক্ষারই সমতুল্য। 'তোতা-কাহিনী'-তে পাখিটিকে প্রকৃতি ও তার নিজস্ব আবাস থেকে কেড়ে নিয়ে খাঁচায় বদ্ধ করার পরামর্শ তাই রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি জীবনের কোল থেকে ছিন্ন করে নিষ্প্রাণ শিক্ষা-খাঁচায় আবদ্ধ করার প্রক্রিয়া। বস্তুত, এ গল্পটির আলোকে মুখস্থবিদ্যা-বিরোধী, প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কোন্নয়ন, রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা, শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ মনোভঙ্গির পরিত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য প্রস্তাবিত প্রবন্ধে উপস্থাপিত হবে। একই সঙ্গে পর্যালোচিত হবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রতিক চালচিত্র ও সীমাবদ্ধতাসমূহ। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনাকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে 'তোতা-কাহিনী' গল্পের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ ও অভিভাষণসূত্রও ব্যবহৃত হবে।*

'তোতা-কাহিনী' গল্পটি শুরুই হয়েছে শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে কটাক্ষ করে। পাখিটির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গান গাওয়া, ওড়া, লাফানো– এগুলোই রাজার চোখে নির্দেশিত হয়েছে পাখিটির মূর্খতা হিসেবে। যেহেতু সে শাস্ত্র পড়ে না, কায়দাকানুন জানে না, তাই রাজার সিদ্ধান্ত 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না'। উপযোগিতার এই বিবেচনা আরও পক্ষপাতী হয়ে ওঠে যখন রাজা অসন্তোষ প্রকাশ করে জানান, পাখিটি বনের ফল খেয়ে রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়। অর্থাৎ পাখিটির সহজাত প্রকাশ ও স্বভাব মনুষ্যস্বার্থের অনুকূল নয় বিবেচনা করেই রাজা পাখিটির জন্য শিক্ষার উদ্যোগ নিলেন। আপন প্রয়োজনের লক্ষ্যে অন্যের উপর শিক্ষা-আরোপের এই অভিসন্ধি ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির শিক্ষা-উদ্যোগের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ

আমরা জানি, উনিশ শতকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনসূত্রে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। উপনিবেশ দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে এ-অঞ্চলে ইউরোপ-বাহিত পুঁজিতন্ত্রের যথার্থ বিকাশ ইংরেজরা আপন স্বার্থেই রোধ করেছে। ফলে পূর্বেকার সামন্তীয় ব্যবস্থার অবলেশ এবং আধা-পুঁজিতন্ত্রের মিশেলে এক অসম্পূর্ণ, অব্যবস্থিত সমাজকাঠামোই উপনিবেশকালীন ও উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ে এ-অঞ্চলের প্রকৃত বাস্তবতা।

ঔপনিবেশিক শাসক তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও তা প্রলম্বিতকরণে ঢেলে সাজায় উপনিবেশিত অঞ্চলের শিক্ষা-কাঠামো। ইংরেজ শাসকও ভারতবর্ষে অনুরূপ কাজটি সম্পন্ন করেছে। লর্ড বেবিংটন মেকলের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্টত ধরা পড়ে এদেশের শিক্ষা-কাঠামো সংস্কারে ইংরেজ-স্বার্থের অন্তর্গত অভীপ্সা। ভারতবর্ষে ইংরেজশক্তি তাদের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে এবং তাদের অনুগত একটি সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগী হয়। ১৮৩৫ সালে শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনায় টমাস বেবিংটন মেকলে স্পষ্ট ঘোষণা করেন–

> বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে যারা আমাদের ও যাদেরকে আমরা শাসন করি তাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। যারা মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবে বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।[১]

অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনে শিক্ষা-বিস্তারের অন্তরালে মূল লক্ষ্য হিসেবে জাগ্রত থাকে প্রশ্নহীনভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও অনুগত এক শ্রেণির সৃষ্টি– যারা ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হবে। মেকলের এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলে যায় 'তোতা-কাহিনী' গল্পের রাজার উদ্দেশ্যও। অর্থাৎ যাকে শিক্ষা দেয়া হবে তার বিকাশ ও উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত না-করে, শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে 'শিক্ষা'র মোড়কে। বলাবাহুল্য, শিক্ষার মাধ্যমে মনোজগৎ দখল এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই পরিকল্পনার মূলে ইংরেজদের বাণিজ্য-স্বার্থই ছিল প্রধান। আজকের নব্য-ঔপনিবেশিক কালে বা বিশ্বায়নের যুগে শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের অন্য জাতি বা রাষ্ট্রের ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রাসের মূলেও একই প্রণোদনা ক্রিয়াশীল। এর ফলাফল যে কতটা ভয়ানক অশুভ তা গল্পের পাখিটির মৃত্যুসংবাদই প্রমাণ দেয়।

একই ভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা রোগলক্ষণ, অসঙ্গতি ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিই প্রমাণ করে– আরোপিত এবং কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হয়ে উঠলে সে-শিক্ষা কল্যাণবাহী হতে পারে না। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিস রাথবোন একটা খোলা চিঠিতে অভিযোগ করেন যে, ভারতীয়রা ইংরেজের দৌলতে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে পুরাদস্তুর উন্নতি করলেন, কিন্তু ইংল্যান্ডের বিপদের সময় তাঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। এই মন্তব্যের প্রতিবাদে ইংরেজিতে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ভারতের সব ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের সে সকল তথাকথিত ইংরেজ-বন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি আমাদের 'শিক্ষাদান' না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতের ব্রিটেনের সরকারী শিক্ষার প্রণালী বাহিয়া যাহা আমাদের সন্তানগণের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে।

উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ। ফলে ভারতীয়রা তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজি ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে সেই ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে, দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখন পঠনক্ষম হইয়াছে। অন্য দিকে রাশিয়ার মাত্র পনেরো বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা ৯৮টি বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (এই সংখ্যাগুলি ইংরেজ-প্রকাশিত 'স্টেটসম্যান্স ইয়ার বুক' হইতে উদ্ধৃত। ঐ বহির রাশিয়ার অনুকূলে পক্ষপাতভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।)"[২]

অথচ প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা আমরা জানি, তার সুনাম সেকালে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। বস্তুত, প্রাচীন ভারতে আর্যদের আগমনের (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-এর পূর্বে) পর, তাদের ভেতর শিক্ষাদান ও গ্রহণের যে-ব্যবস্থাটি ছিল, তা-ই কালক্রমে এ অঞ্চলে প্রসারিত ও বিকশিত হয়। পুরোহিতরাই ছিলেন আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহক। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদকে ঘিরেই সেকালে সূচনা হয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা। বেদজ্ঞ ঋষিরাই ছিলেন প্রথম স্তরের শিক্ষক। বেদ-বিদ্যা লাভ করে ঋষিদের ন্যায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য অন্যেরা ঋষিগৃহে সমবেত হতেন। ঋষি-পরিবারই ছিল আদি বৈদিক যুগের 'গুরুকুল'। ঋষিগৃহে থেকেই পুরোহিতদের মধ্যে প্রথম বেদ-বিদ্যার প্রসার হয়। কালক্রমে, বৈদিক যুগের উপাসনা-পদ্ধতি, যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে বেদ-বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাও প্রসারিত হয়। পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার অনুকূল বিষয় শিক্ষার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়।[৩] উল্লেখ্য যে, আদি বৈদিক যুগে সমাজে বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি হলেও (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) তা ছিল মূখ্যত কর্মগত। তাই শ্রেণিবিভাজনের রীতি-নীতি তখনও জটিল, কঠিন ও অপরিবর্তনীয় ছিল না। তৎকালীন ঋষি এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের যে ব্রাহ্মণ হতেই হবে এমন কোনো সুদৃঢ় জন্মভিত্তিক রীতি তখনও প্রবর্তিত হয় নি। সেকালে তপস্যার মাধ্যমে বহু নরপতি (ক্ষত্রিয়) ঋষির মর্যাদা পেয়েছিলেন। নারীরাও সে যুগে যাগ-যজ্ঞাদির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন। ঋকবেদের মতে অনার্যরাও তখন শিক্ষালাভের অধিকারী ছিলেন।

সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ঋষি বা গুরুর গৃহে। তপোবনের শান্ত নির্জন পরিবেশে ঋষির কুটির ছিল শিক্ষালয়ের আদিম রূপ। উপনয়নের মত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিষ্যরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশের অনুমতি লাভ করত। আচার্যের কুটিরে গুরু-শিষ্য ঠিক পিতাপুত্রের মতো নিবিড় স্নেহ-সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস ও বিদ্যাচর্চা করতেন। গুরুগৃহে গুরুই শিক্ষার্থীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেন। শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর গুরুদক্ষিণা প্রদান করত। এসময় বেতনভুক্ত শিক্ষক সমাজে নিন্দিত হতেন। গুরুর প্রথম কর্তব্য ছিল শিষ্যকে পুত্রবৎ স্নেহে পালন করা এবং শিষ্যের সুশিক্ষা দানই ছিল গুরুর ধর্মীয় কর্তব্য। শিষ্যকে জ্ঞানরাজ্যের সর্বস্ব দান করাই ছিল গুরুর মানসিক উদারতা। গুরুকে হতে হতো নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান, সুপণ্ডিত, স্নেহপ্রবণ, ত্যাগী। অর্থ ও সম্মানের আশা ত্যাগ করে নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মোৎসর্গী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষাদানের জন্য গুরু ছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় ব্যক্তি। গুরু কেবল শিক্ষার্থীকে ধর্ম-শিক্ষাই প্রদান করতেন না, প্রকৃতির অপার সান্নিধ্যে প্রকৃত মানুষের গুণাবলিও শিষ্যের মাঝে সঞ্চারিত করতেন।

অর্থাৎ এখানেই শিক্ষার্থী লাভ করত দ্বিতীয় জন্ম। গুরুর শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীরও ছিল কিছু অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। গুরুর গৃহে ভর্তির যোগ্যতা বিচারে ছিল শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র ও বাঞ্ছনীয় আচার-আচরণ। নৈতিকতার বিচারে হীন প্রতিপন্ন হলে গুরুর গৃহে তার স্থান হতো না। সেকালে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালন ছিল বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি আবাসিক ছাত্র হিসেবে গুরুর সেবা ও তার পরিবারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে হতো। অর্থাৎ সেকালে আশ্রমবাসী গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা ও সন্তানের তুল্য। শ্রদ্ধা ও স্নেহের এই সম্পর্ক বন্ধনের ভেতর দিয়েই সম্পন্ন হতো শিক্ষা কার্যক্রম।

কালক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা আরও পরিণত ও প্রসারিত হয়েছে। ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যেমন : অঙ্কশাস্ত্র, নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা, রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র, সঙ্গীত, শিল্প, কলা, নাট্যশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি। সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ– নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীলা, বলবী, ওদন্তপুরী, মিথিলা, নবদ্বীপ শিক্ষাকেন্দ্র। জানা যায়, হিউয়েন সাঙের সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন। এদের সবার ভরণপোষণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রদান করা হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসতেন।[৪] কিন্তু ভারতবর্ষের এই গৌরবান্বিত শিক্ষাব্যবস্থা ধসে পড়ে শাসককুলের পরিবর্তনের মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় আঘাতটি আসে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর। ভিনদেশি শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে এ অঞ্চলে শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক কালে স্থাপিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অযৌক্তিকভাবে অধিক অর্থে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। যার লক্ষ্য ছিল– উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সন্তানরাই এই শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হবে এবং গড়ে উঠবে ইংরেজ ভাবধারায় ও আদর্শে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত শিক্ষা এদেশীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে জীবন যোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে নি, বরং শিক্ষার অহমিকা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দৌরাত্ম্যে ক্রমশ ব্যবধানের মাত্রা সম্প্রসারিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর এই ত্রুটি সেকালে রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন– 'আমাদের দেশে প্রচলিত বিদ্যা প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্য ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড় জাতিভেদ এইখানেই– শ্রেনিতে অস্পৃশ্যতা।' অন্যত্র তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্মূলতাকে–

> সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফ প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে।[৫]

সেকালের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ফল সম্পর্কে ১৮৭৫ সালে 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকা লিখেছিল :

> ইংরেজী শিক্ষার ফলে নেটিভরা হয়ে উঠেছে বিলাসী এবং সব জিনিসের জন্য এমনকি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, যেমন কাগজ, কলম প্রভৃতির জন্যেও হয়ে উঠছে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল। এখনও তারা এগুলি উৎপাদন করতে শেখেনি। তাদের আগ্রহ আছে শুধু চাকরিতে; কিন্তু চাকুরির বাজারেও মন্দা। এ দুর্দশার কারণ বিবিধ– এক. ইংরেজী শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা, দুই. দূরদর্শিতা এবং উদ্যমের অভাব। আমাদের স্কুলগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, কোন একটি বিশেষ ব্যাপারে জোর দেয়া হয় না। দেশীয়দের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অনুৎপাদনশীল ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা।[৬]

শিক্ষাকে পুঁজির সঙ্গে একাত্ম করে সার্থক বিনিয়োগ হিসেবে দেখার চোখ তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক কালে। 'লেখাপড়া করে যে/ গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে'– এই প্রবাদের অন্তরালে লুকিয়ে আছে সেই বিনিয়োগের স্বপ্নমন্ত্র। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণিও এভাবে তৈরি হয়েছিল ইংরেজ আমলে। যাদের একান্ত আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে সেকালে ইংরেজ প্রশাসনের প্রতি, স্বীয় অস্তিত্বের তাগিদে। সেই সঙ্গে তারা মর্যাদা, আভিজাত্য আর কর্তৃত্বের অহমিকায় 'অপর' করে রেখেছে শ্রমজীবী মানুষকে। কায়িক শ্রমকে অবহেলা আর অমর্যাদার চোখে দেখার সেই ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি লুপ্ত হয় নি আজো। ঔপনিবেশিক কালে শিক্ষার মূল লক্ষ্যই ছিল চাকরি লাভ। চাকরি লাভ অর্থাৎ আর্থিক নিরাপত্তাকে শিক্ষা অর্জনের মুখ্য কারণ হিসেবে যেমন সেকালে দেখা হয়েছিল, তেমনি সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্যের সূচকও হয়ে ওঠে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি। এই মূল্যবোধ ক্রমাগত আরও দৃঢ়মূল ও বিস্তারিত হয়েছে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষাকাঠামোর যে-আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল, তা অদ্যাবধি সম্পন্ন হয় নি। ফলে, ঔপনিবেশিক শিক্ষাকাঠামোর আদলে পরিচালিত হচ্ছে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে চাকরির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে সদ্য পাশ করা ঝাঁকে-ঝাঁকে তরুণ। তাদের এই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজি মাধ্যমে শত শত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি বা বিদেশ-গমনের স্বপ্নপূরণের পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠান আভিজাত্যের নির্দেশকেও পরিণত হয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পড়াবার জন্য মাত্রাতিরিক্ত অর্থব্যয়েও কার্পণ্য করছে না উচ্চবিত্ত শ্রেণি। এমনকি মধ্যবিত্ত শ্রেণিও উপার্জনের সর্বস্ব বিনিয়োগ করে নেমে পড়ছে আভিজাত্য প্রদর্শনের এই প্রতিযোগিতায়। এভাবে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে চলেছি আমরা।

'তোতা-কাহিনী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির অসারতাকেও নির্দেশ করেছেন। গল্পে দেখতে পাই, রাজপণ্ডিতেরা পাখিটির 'অবিদ্যা'র কারণ অনুসন্ধান ও তা উত্তরণের সমাধান খুঁজতে ব্যাকুল। শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, 'সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।' অর্থাৎ পাখির শিক্ষার জন্য প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খাঁচা-বন্দী পরিবেশ-নির্মাণের পক্ষে মত দিলেন রাজপণ্ডিতেরা। বলাবাহুল্য, অদ্যাবধি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো এই আবদ্ধকরণ ও প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতার স্রোতেই বহমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চান নি। প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে ইট-পাথরের রুদ্ধ কক্ষে যে-শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ তাকে জীবনের শিক্ষা বলতে নারাজ।

১৩২৯ সালের ভাদ্র-আশ্বিনের শান্তিনিকেতন পত্রিকায় তিনি জানান, 'প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবন সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলে ফেলা হয়।–প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে-বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।'[৭] প্রচলিত স্কুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও তাই নেতিবাচক। 'শিক্ষা সমস্যা' (১৩১৩) প্রবন্ধে স্কুলের পাঠ-পদ্ধতিকে যান্ত্রিক কাঠামো অভিহিত করে তিনি লিখেছেন, 'ইস্কুল বলিতে আমরা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে।'[৮]

কেবল প্রকৃতি থেকে নয়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, স্বজন, চারপাশের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা, খাঁচাবন্দী তোতাপাখির প্রাণহীন নির্জীব শিক্ষারই সমতুল্য। 'তোতা-কাহিনী'-তে পাখিটিকে প্রকৃতি ও তার নিজস্ব আবাস থেকে কেড়ে নিয়ে খাঁচায় বদ্ধ করার পরামর্শ তাই রবীন্দ্রনাথ তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি জীবনের কোল থেকে ছিন্ন করে নিষ্প্রাণ শিক্ষা-খাঁচায় আবদ্ধ করার প্রক্রিয়া। জীবন ও পারপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্যুত এই শিক্ষার ফলাফল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন :

> বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই– যাহা বাহির হইতে সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব, তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটি এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে, তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।[৯]

প্রচলিত শিক্ষা-কাঠামোর ত্রুটি ও অসারতাকে চিহ্নিত করেই রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হন নি। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ও তিনি ভেবেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের শিক্ষাভাবনাকে তিনি বাস্তবে প্রয়োগ করারও উদ্যোগ নিয়েছেন। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন' সেই উদ্যমেরই ফল। সেখানে প্রাচীন ভারতের তপোবনের মতো উন্মুক্ত শিক্ষা-পরিবেশ তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতিতেও আস্থা রাখতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যা ও তা আয়ত্ত করার অর্থাৎ মুখস্থকরণ প্রক্রিয়াকে শিক্ষার যথার্থ পথ বলে তিনি স্বীকার করেন নি। 'তোতা-কাহিনী' গল্পে প্রচলিত এই ব্যবস্থাকে বিদ্রূপের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন তিনি। গল্পে দেখতে পাই, পাখিটির শিক্ষা-প্রদানের শুরুতেই পণ্ডিত "নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।' ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না।" পুঁথির এই সাড়ম্বর আয়োজনের পাশাপাশি চলল পুঁথি-গেলানোর মর্মান্তিক উদ্যম– 'খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা।

দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।'[১০] বলা বাহুল্য, পাখির বিদ্যা-শিক্ষার এই রোমাঞ্চিত আয়োজন, আমাদের প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতিরই মূর্ত চিত্র। বস্তুত, পাখিটির শিক্ষাদান-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তিনটি বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছেন– পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা, জোরপূর্বক মুখস্থকরণ ও শিক্ষায় মাতৃভাষাকে উপেক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর জীবনের সব প্রান্তকে স্পর্শ করে এমন পাঠক্রম রচিত হওয়া উচিত। তিনি পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই, তিনি পাঠক্রমে সেই সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিত্তে মানবসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর প্রস্তাবিত পাঠক্রমের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, পরিবেশ, পল্লি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প এবং বেশ কিছু সামাজিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[১১] এভাবে, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশেরই সহায়ক। তাঁর শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীকে রাশি-রাশি পুঁথি ও তা মুখস্থের ভারে তোতাপাখির করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় না, বরং শিক্ষার্থীকে করে তোলে জীবনমুখী, স্বপ্নমুখী ও মানবমুখী।

পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা ও মুখস্থ বিদ্যাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক নানা প্রবন্ধেও তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ভ্রমণের প্রতি, প্রকৃতি ও জীবনের সংযোগের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষার প্রতি। তাঁর ভাষায়–

> আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষা প্রবাহের তাল মেলে। বদ্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজজ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচার মধ্যে পাখিকে বাঁধাখোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না। বনের পাখি ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল করে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল করে মানুষকে শেখানো।[১২]

আর একারণেই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে– রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে, চিত্রে, সঙ্গীতে তাদের হৃদয় শতদল পদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। এই আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি মুখস্থ বিদ্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল তীব্র বিরূপ মনোভাব। তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই বিরূপতা–

> মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষামালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে দেখাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?[১৩]

এই মুখস্থ বিদ্যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমনই সুদূরপ্রসারী প্রভাব জিইয়ে রেখেছে যে, এর পৃষ্ঠপোষকরূপে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন অভিভাবকদের। তাঁর মতে, 'জানি, এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে?'[১৪]

আশার কথা, সম্প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে) মুখস্থবিদ্যার গুরুত্ব হ্রাস করে শিক্ষার্থীর অনুধাবনশক্তি, বিশ্লেষণশক্তি ও সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে 'সৃজনশীল পদ্ধতি'র প্রচলন করা হয়েছে। পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত বিকাশের অনুকূল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন বড় ধরনের একটি পরিবর্তন শিক্ষাব্যবস্থায় ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষকদের যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল, তা যথার্থভাবে সম্পন্ন হয় নি। ফলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা তো বটেই, অনেক স্থানে শিক্ষকরাও 'সৃজনশীল পদ্ধতি' সম্পর্কে স্পষ্ট নন। প্রশ্ন করার জন্য তারা দ্বারস্থ হচ্ছেন বাজারে প্রচলিত নোট বইয়ের। শিক্ষার্থীরাও অনুসরণ করছে নোট বই। ফলে এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। নম্বরপ্রাপ্তির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা মুখস্থবিদ্যার জালেই বন্দী হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'সৃজনশীল পদ্ধতি' নিয়ে তেমন কোনো ভাবনার প্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা ও মূল্যায়ন-পদ্ধতি সেই ঔপনিবেশিক আমলের কাঠামো থেকে বের হতে পারে নি। ফলে এখানেও মুখস্থবিদ্যার জয়জয়কার।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন মাতৃভাষাকে। 'তোতা-কাহিনী'র পাখিটির মাতৃভাষা– গান। বিভাষী পুঁথির গলাধঃকরণে তার গান রুদ্ধ হয়েছে, এমনকি চিৎকার করে প্রতিবাদ জানানোর শক্তিও লুপ্ত হয়েছে। পরভাষায় শিক্ষাদানের ফল এমনই ভয়াবহ। ইংরেজশক্তির প্রচেষ্টায় ঔপনিবেশিক কালে ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের যে-রেওয়াজ তৈরি হয়েছিল, বর্তমান বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পরও সেই একই চিত্র বিদ্যমান। উপযোগিতার দোহাই ছাড়াও সেকালের ইংরেজি ভাষা জানার আভিজাত্য-প্রদর্শন একালেও ক্রিয়াশীল। ঢাকার অলিতে-গলিতে গড়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। কেবল রাজধানী ঢাকা নয়, দেশের বিভিন্ন জেলাতেও এখন ক্রমশ বাড়ছে ইংরেজি শিক্ষামাধ্যম। এদেশের অভিভাবকশ্রেণিও গৌরবান্বিত বোধ করেন এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করিয়ে। অথচ, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বরাবরই রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন মাতৃভাষার উপর। শৈশবে ভিন্ন ভাষায় শিক্ষা লাভের ফলে ভাব ও ভাষার প্রকৃত সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে না। এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। .... ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোক য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে।[১৫]

বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতাও চোখে পড়ে না। বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ বা বাংলায় রচনা করে সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারত। কিন্তু স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ভীষণ হতাশাজনক। ফলে, হাতে গোনা দু-একটি বিভাগ বাদে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যসব বিভাগে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জন্য নির্ভর করতে হয় ইংরেজি ভাষায় রচিত মূল ও রেফারেন্স গ্রন্থের ওপর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'তোতা-কাহিনী' গল্পে শিক্ষাবিস্তারে রাষ্ট্রশক্তির আড়ম্বরপ্রিয়তা ও তার অসারতাকে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বারম্বার চিত্রিত করেছেন। গল্পে আমরা দেখতে পাই, একটি পাখির শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পেশাজীবীর বহু মানুষের সন্নিবেশ। পাখিটির শিক্ষা তদারকির জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রাজার ভাগিনাকে। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বজনপ্রীতির এ নিদর্শন নিঃসন্দেহে আরও আশঙ্কাজনক। এরপর পাখিটির মূর্খতার কারণ সন্ধানে জড়ো করা হয়েছে রাজপণ্ডিতদের, প্রচলিত ভাষায় যার নাম 'শিক্ষা কমিশন'। 'শিক্ষা কমিশনে'র পরামর্শে সোনার খাঁচা (স্কুল ঘর) নির্মাণে নিযুক্ত হয়েছে স্যাকরা। অতঃপর পণ্ডিত এলেন পাখিটিকে শিক্ষা দিতে। যেহেতু প্রচুর পুঁথির প্রয়োজন, ফলে তলব করা হলো পুঁথি-লেখকদের। পাখিটির শিক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল সোনার খাঁচা। এবার সেই খাঁচার মেরামত, ঝাড়া-মোছা-পালিশের জন্য প্রয়োজন পড়ল 'বিস্তর লোক'। তারা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কি-না, তা তদারকির জন্য লোক নিযুক্ত হলো 'আরও বিস্তর'। বলাবাহুল্য, আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের এই অপচয় ও অসার আয়োজন আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ করছি।

গল্পের শেষাংশে পাই, আধ-মরা অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ পাখিটিকে শায়েস্তা করার জন্য শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন নিয়ে হাজির হয়েছে কামার। লোহার শিকল তৈরি হলো, পাখির ডানাও কাটা হলো। সবশেষে, মৃত পাখির রাজপ্রাসাদে আগমনও আড়ম্বরতায় পূর্ণ– 'পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।' ক্ষুদ্র একটি পাখির শিক্ষা নিয়ে এতো আয়োজন, আড়ম্বরতা ও অপচয়কে অতিরঞ্জন মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও তার ফল পর্যালোচনা করলে গল্পের অতিরঞ্জনটাই বাস্তব সত্য রূপে প্রতিভাত হয়।

লক্ষণীয়, পাখিটির শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখার জন্য রাজা একবার শিক্ষাশালায় আগমন করেন। রাজাকে স্বাগত জানাতে বেজে উঠল শাঁখ-ঘণ্টা-ঢাক-ঢোল ইত্যাদি। পণ্ডিত, মিস্ত্রি, মজুর, স্যাকরা, লিপিকর, তদারকনবিশ সকলে জয়ধ্বনি তুলল। এমন জাঁকজমক অভিবাদনে রাজা ভুলেই গেলেন পাখিটিকে দেখবার কথা। ফেরার পথে নিন্দুক মনে করিয়ে দেওয়ার পর, রাজা আবার ফিরলেন শিক্ষাশালায়। পাখিকে কীভাবে শেখানো হয়, তার কায়দাটা রাজা দেখতে চাইলেন। দেখাও হলো। তিনি 'দেখিয়া বড় খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই।'[১৬] উদ্দেশ্যের চেয়ে আড়ম্বরতা যখন বড় হয়ে ওঠে, তখনই এমন দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হয়। শিক্ষার চেয়ে আনুষঙ্গিক আয়োজনই রাজার কাছে বড় মনে হয়েছে, আর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিণাম বহন করতে হয়েছে পাখিটিকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়ও উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ফলের কোনো পারম্পর্য নেই। শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুগত শ্রেণির স্বার্থসিদ্ধিই হয়ে উঠছে সকল উদ্যোগের অন্তিম প্রেরণা। ফলে 'দারিদ্র বিমোচনে শিক্ষা' 'কর্মমুখী শিক্ষা', 'অবৈতনিক শিক্ষা', 'দারিদ্রদের উপবৃত্তি প্রদান' সকল উদ্যোগের ফল শেষাবধি হতাশাজনক। কেবল, তাদের জন্যই লাভজনক হয়ে উঠছে এসব নানামুখী আয়োজন, যারা রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে কোনো-না-কোনো সূত্রে জড়িয়ে আছে। 'তোতা-কাহিনী' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন পাখির শিক্ষাকে কেন্দ্র করে কত জনের সোনার হার, শিরোপা অর্জনের পাশাপাশি 'সিন্দুক বোঝাই' হলো।

সন্দেহ নেই, ধাপে-ধাপে চোখে আঙুল দিয়ে প্রাপ্তিযোগের বিষয়টি এতবার দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ– শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে কীভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ভিন্নপথে ধাবিত হয়, তাকে স্পষ্ট করা। রবীন্দ্রনাথ সেকালে যেমন এই অপচক্রকে অনুধাবন করেছিলেন, আজকের দিনে আমরা তা হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রশক্তির শুভবোধের বিকাশ ও তার প্রয়োগ ছাড়া এই দুর্লক্ষণ নিরাময়ের উপায় নেই।

'তোতা-কাহিনী' গল্পে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিয়েও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রচ্ছন্ন পরিচয় মেলে। বিপুল পরিমাণ পুঁথি সংগ্রহ ও সেসবের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কলমের ডগা দিয়ে পাখির মুখে প্রবেশ করানোর চিত্রটি শিক্ষার্থীকে মুখস্থপ্রবণ করে তোলার প্রচলিত শিক্ষণ-পদ্ধতিকেই নির্দেশ করে। অপরদিকে, পাখিটি চায় সকাল বেলার আলো মাখতে, গান গাইতে, পাখা ঝাপটাতে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর এই মেরুপ্রতিম পার্থক্য কোনো সুস্থ সম্পর্কের জন্ম দেয় না। ফলে 'বেয়াদব' 'অকৃতজ্ঞ' পাখিটির ডানা কেটে 'পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।'– বস্তুত, এই 'শিক্ষা' শায়েস্তা করার নাম। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক প্রয়োজন, তা এই জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে কখনো রক্ষা করা সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী মুক্তি চায়– শিক্ষা থেকে, শিক্ষক থেকে। আর শিক্ষক ততোধিক উদ্যমে শিক্ষার্থীকে বাঁধতে চায়, দমাতে চায়, শাসাতে চায়। ফলে পরস্পরের বোধের যে-সেতু দিয়ে শিক্ষাযাত্রা সাবলীল হওয়ার কথা, সেই ভগ্ন সেতুর গোড়ায় এসে শিক্ষা স্থবির হয়ে পড়ে, জ্ঞানের পারাপার হয় না।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার বিস্তৃত বিবরণ পাই তাঁর 'শিক্ষা' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ করেছেন, আধুনিক কালে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীর অনেক অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধ, শিক্ষকেরও অভিযোগের অন্ত নেই। শিক্ষককে একালে শিক্ষার্থী আর যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে না, সম্মান দেখায় না। শিক্ষকও ছাত্রকে সন্তানবৎ স্নেহ করেন না, তার কল্যাণ কামনা করেন না। শিক্ষক আজ অর্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী মাত্র– শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ আর্থিক লেনদেনের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার অবসান প্রত্যাশা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ। সুতরাং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বদলে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ববাহী। তিনি মনে করেন, শিক্ষকের সেবামূলক মনোভাব একান্ত জরুরি। পাশাপাশি শিক্ষকের থাকতে হবে চিরন্তন জ্ঞানপিপাসা। শিক্ষকের জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকলে তিনি কিছুতেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানচাহিদা মেটাতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, '...গুরু করবেন বিদ্যা সৃষ্টির সাধনা, শিষ্য করবে বিদ্যা গ্রহণের সাধনা, যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান, সেখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়'। জ্ঞানপিপাসা ও বিদ্যা সৃজনের প্রতি শিক্ষকের অকুণ্ঠ সমর্পণের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষকের সাত্ত্বিকগুণের প্রতিও। যাদের জাগতিক প্রত্যাশা বেশি, প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যাদের প্রবল তাদের শিক্ষকতার পেশায় না আসারই পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, 'জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে।

সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ হয় না। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।' কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখছি, শিক্ষকরা আর্থিক লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টার প্রভৃতি কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ক্লাসে মনোযোগ কম দিয়ে বাইরের এসব তৎপরতার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাছেও স্পষ্ট। ফলে শ্রদ্ধা হারাচ্ছেন শিক্ষকরা। শিক্ষা পরিণত হচ্ছে অর্থ দিয়ে কেনা কোনো পণ্যের মতো। আর এসব কারণে এদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উন্নয়ন তো নয়ই, ক্রমশ অধোগামী হচ্ছে। যে-কোনো সভ্য রাষ্ট্রের জন্য এই লক্ষণ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সংকেত।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর জীবনদর্শন। ঔপনিবেশিক শিক্ষাকাঠামোর বদলে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শকে যুগোপযোগী রূপ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। দেশীয় রুচি-আদর্শ-মানুষের সঙ্গে পরিচয়, সর্বোপরি প্রকৃতি থেকে শিক্ষালাভকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। বদ্ধ ক্লাসরুম থেকে, চাপিয়ে দেয়া শিক্ষা ও মুখস্থকরণের ভার থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিয়ে তিনি চেয়েছেন আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের সহায়ক হয়ে উঠবে শিক্ষা-ব্যবস্থা। 'কোনো সন্দেহ নেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল ভিত্তি ছিল প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমের শিক্ষা কিংবা তপোবনের শিক্ষা, কিন্তু তিনি সমকালীন বা কিছু পূর্ববর্তী শিক্ষাচিন্তাবিদদের শিক্ষাচিন্তাকে তাঁর নিজের শিক্ষাভাবনা ও কর্মের সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েছিলেন। এই সংশ্লেষণই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার অনন্যতা। তবে শুধু একজন শিক্ষাচিন্তাবিদ হিসেবে নয়, একজন শিক্ষাচর্চাকারী (educational practitioner) হিসেবেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখেছি আমরা।'[১৭] রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে শিক্ষা সম্পর্কে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন– যেমন শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা, প্রকৃতি বা পরিপার্শ্বের অনুপস্থিতি, ভালো পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমের (ভাষার) প্রতি অনীহা, ডিগ্রিনির্ভর শিক্ষা ইত্যাদি সমস্যা এখনও দূর হয় নি কিংবা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। কিছু কিছু প্রসঙ্গ আবার বেশ জটিল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে এসব শিক্ষাসমস্যার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বাস্তবানুগ সমাধান দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নানা প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও চিঠিপত্রে তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি। 'তোতা-কাহিনী'ও তাঁর শিক্ষাচিন্তার উজ্জ্বল প্রকাশ। এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত শিক্ষা-ভাবনা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো গেলে, তা-ই হবে যথার্থ শিক্ষার পথ, মুক্তির পাথেয়।

তথ্যসূত্র:

১. টমাস বেবিংটন মেকলে, 'মিনিট অন দ্যা ইন্ডিয়ান এডুকেশন', উদ্ধৃত : *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ,* (সম্পাদনা– ফকরুল চৌধুরী), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৭৪

২. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১১৫

৩. গৌরদাস হালদার, *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ),* ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১০-১৩

৪. গৌরদাস হালদার, *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ),* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বভারতী', উদ্ধৃত : শিপ্রা সরকার, *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উন্নয়ন-ভাবনা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৪

৬. হিন্দুরঞ্জিকা, ১৭.০৪.১৮৭৫, উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র* (১৮৪৭-১৯০৫), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৭, পৃ. ১০৭

৭. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''শিক্ষাসমস্যা'', 'শিক্ষা', *প্রবন্ধসমগ্র,* সময় প্রকাশন, ঢাকা, আগস্ট ২০০০, পৃ.

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষাসমস্যা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৮

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তোতা-কাহিনী', কিশোর রবীন্দ্র-রচনাসংগ্রহ ২, (সম্পাদনা– হায়াৎ মামুদ), প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৪৪

১১. শিপ্রা সরকার, *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উন্নয়ন-ভাবনা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৭

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার বাহন', প্রবন্ধসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৯

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি', প্রবন্ধসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৩

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''শিক্ষার হেরফের'', 'শিক্ষা', প্রবন্ধসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৬

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তোতা-কাহিনী', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪

১৭. মাসুদুজ্জামান, *রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাভাবনা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১২